পণ্ডিতের খেলা

সে প্রায় দেড়শত বৎসরের আগেকার কথা, একদিন এক ইংরাজ বুড়ি তাহার জানলা দিয়া দেখিতে পাইল যে, পাশের বাড়িতে বাগানে বসিয়া একজন বয়স্ক লোক সারাদিন কেবল বুদ্বুদ উড়াইতেছে। দুদিন চারদিন এইরকম দেখিয়া বুড়ি ভাবিল লোকটা নিশ্চই পাগল- তা না হইলে, কাজ নাই কর্ম নাই, কেবল কচি খোকার মতো বুদ্বুদ লইয়া খেলা-এ আবার কোন্ দেশী আমোদ? বুড়ি তখন ব্যস্ত হইয়া থানায় গিয়া খবর দিল।

যে লোকটি বুদ্বুদ উড়াইত, পুলিশে তাহার খবর লইতে গিয়া দেখিল, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং সার আইজাক নিউটন-যাঁহার মতো অত বড়ো বিজ্ঞানবীর হাজার বৎসরে দুটি পাওয়া দুষ্কর। বুদ্বুদের গায়ে যে রামধনুর মতো জমকাল রঙ দেখা যায়, নিউটন তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নিউটনের পরেও ইয়ং প্রভৃতি বড়ো-বড়ো পণ্ডিতেরা এই অনুসন্ধান লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছেন, এবং তাহার ফলে, আলোক জিনিসটা যে কি , এ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

মেঘের গায়ে রামধনুকের রঙ দেখিতে যে খুবই সুন্দর তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখিলে সকলেরই মনে কৌতূহল জাগে। শুধু মেঘের গায়ে নয়, আলোকের রঙিন খেলা স্ফটিক পাথর বা কাঁচের ঝাড়ে কেমন করিয়া ঝিক্‌মিক্ করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেখায় আর পণ্ডিতের দেখায় আনেক তফাত। নিউটন সেই রঙের খেলাকে নানারকমে খেলাইয়া দেখিলেন, আসল ব্যাপারটা কি। তার পর এই একই ব্যাপারের সন্ধান করিয়া কত পণ্ডিত যে কত নূতন তত্ত্ব বাহির করিলেন তাহার আর অন্ত নাই। কিন্তু আজও তাঁহাদের কৌতূহল মিটে নাই। বর্ণবীক্ষণ (spectro-scope) যন্ত্রে সূর্যের আলোক দেখায় যেন রামধনুকের ফিতা। সেই ফিতার মধ্যে রঙের মালা কেমন করিয়া সাজানো থাকে পণ্ডিতেরা হাজাররকম উপায়ে তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। এক একরকম আলোর এক-একরকম রঙিন মালা। সূর্যের আলোক বর্ণবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, সূর্যের ভিতরকার গোলকটা যেমন গরম তাহার বাইরের আগুনটা সেরকম গরম নয়। সূর্যের আলোর রঙিন ছটায় তাঁহারা এক- একটা ছি, দেখেন আর মাপিয়া বলেন, এটা লোহার জ্যোতি-এটা হাইড্রোজেনের আলো- এইটা গন্ধকের ছি, এইটা অঙ্গারের রেখা, এইটা ক্ষারের ধাতুর, এইটা চুনের ধাতুর- ইত্যাদি। তারার আলোর রামধনু ফলাইয়া তাঁহারা বলিতে পারেন, এই তারাটা গ্যাসের পিণ্ড, এই তারাটা জমাট আগুন, এই তারাটা বাষ্পে ঢাকা। এই-সমস্ত সংকেত শিখিবার মূলে ঐ রামধনুক দেখিবার কৌতূহল।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের সমুদ্রকূলে কতগুলা লোক প্রতিদিন ঘুড়ি উড়াইত, আর ঘন্টার পর ঘন্টা পড়িয়া থাকিত। সেখানকার নাবিকেরা এই নিষ্কর্মা লোকেদের ছেলেখেলা দেখিয়া ঠাট্টা-তামাশা করিত। তাহারা জানিত না যে ঐ নিষ্কর্মার সর্দারটির নাম মার্কনি-সেই মার্কনি, যিনি বিনা তারে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার কল বানাইয়াছেন। তারের সূতায় বাঁধা প্রকাণ্ড ঘুড়ি আকাশে উড়িত, আর একটা লোক সেই তারের সঙ্গে টেলিফোনের কল জুড়িয়া কান পাতিয়া পড়িয়া থাকিত। তার পর একদিন যখন সেই টেলিফোনের কলের মধ্যে টক্‌টক্ শব্দ শোনা গেল, তখন সকলের আনন্দ দেখে কে! তাহারা জানিত যে ঐ শব্দ আসিতেছে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপার হইতে। এমনি করিয়া ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় বিনা তারে বিদ্যুতের খবর চলিতে আরম্ভ করিল।

ইংলণ্ডের যাঁহারা নামজাদা পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের নাম বিশেষ স্মরণীয়। এক দপ্তরীর পুরাতন বইয়ের দোকানে কাজ করিয়া ফ্যারাডে অবসরমতো দোকানের বইগুলা পরিতেন। এমনি করিয়া তাঁহার মনে শিখিবার আগ্রহ জাগিয়াছিল। তার পর এক অজানা ভদ্রলোকের অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ভালো বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে সেই কৌতূহল মিটাইতে গিয়া তিনি একজন আসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিদ্যুতের শক্তিতে কল চালাইবার সংকেত তিনিই আবিষ্কার করেন! বিদ্যুতের কল এখন পৃথিবীর সর্বত্রই চলিতেছে-বিদ্যুৎ ছাড়া সভ্য-দেশের কাজ চলাই অসম্ভব। অথচ ফ্যারাডে যখন সর্বপ্রথম একটি ছোটো চাকাকে বিদ্যুতের বলে ঘুরাইবার সংকেত দেখাইলেন, তখন অনেক লোকেই সেটাকে নেহাত একটা তামাশার জিনিসমাত্র মনে করিয়াছিল। কেহ কেহ ফ্যারাডেকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, এইরকমের খেলা বানাইয়া তাঁহার মতো পণ্ডিত লোকের লাভ কি? ফ্যারাডে হাসিয়া বলিতেন, নূতন একটা জ্ঞানলাভ করিলাম, ইহাই তো যথেষ্ট লাভ। আর

কোনো লাভ যদি নাও হয় তাহাতেই-বা দুঃখ কি?

গ্রামোফোনের কথা জানে না, এমন শিক্ষিত লোক আজকাল পাওয়া কঠিন। কিন্তু শব্দকে যে যন্ত্রের সাহায্যে ধরিয়া রাখা যায়, এ কথাটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষের কল্পনায় আসে নাই। এডিসন যখন ফোনোগ্রাফের আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার কর্মচারীরা কেহ কেহ ভয় পাইয়াছিল। ঘরে মানুষ নাই, তিনি কেবল একটা চোঙার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তার পর এডিসন যখন তাহাদের ডাকিয়া কলের আওয়াজ শুনাইলেন তখন কলের মধ্যে বিকৃত গলায় মানুষের মতো শব্দ শুনিয়া তাহাদের ভয়টা ঘোচে নাই, কিন্তু এইটুকু তাহারা বুঝিয়াছিল যে ব্যাপারটা নেহাত পাগলের খেলা নয়।

বিলাতের পিল্‌ট্‌ ডাউন নামক স্থানে কতগুল মজুর মাটি খুঁড়িতেছিল। মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে পাথরের টুকরার মতো কি-সব জিনিস বাহির হইত, একজন সাহেব সেইগুলো পয়সা দিয়া কিনিয়া লইত। সেগুলা যে প্রাচীন মানুষের ছি মজুরেরা তাহা জানিত না। তাহারা পয়সার লোভে সেই-সব সংগ্রহ করিয়া রাখিত, কিন্তু সাহেবটি পিছন ফিরিলেই তাহারা হাসাহাসি করিত,আর ইঙ্গিত করিয়া বলিত, লোকটার মাথায় কিছু গোল আছে। একদিন হঠাৎ খুলির হাড়ের মতো এক টুকরা জিনিস পাইয়া সেই সাহেবের উৎসাহ ভয়ানক চড়িয়া গেল- এবং কিছুদিন বাদে কোথা হইতে এক বুড়া আসিয়া সেই সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া মাটি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। একটার জায়গায় দুইটা পাগলকে দেখিয়া মজুরদেরও আমোদ বাড়িয়া গেল, কারণ ইঁহাদের উৎসাহের কারণ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দুজনের চেষ্টায় যাহার আবিষ্কার হইল বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন পিল্‌ট্‌ ডাউনের খুলি। ইহা অতি প্রাচীনকালের একটা মানুষের মাথার টুকরা। কেহ কেহ বলেন এত প্রাচীন মানুষের ছি আর পাওয়া যায় নাই। খুলিটার বয়স লইয়া পণ্ডিতমহলে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। ইহার জন্য সাহেবদুটি ছয় মাস ধরিয়া মাটিতে বসিয়া রাবিশ ঘাঁটিয়াছিলেন!

বনচাঁড়ালের গাছের পাতা আপনা-আপনি কাঁপিতে থাকে। ইহা অনেক লোকেই দেখিয়াছে কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কৌতূহল ইহাতে জাগিয়া উঠিল। তিনি যে কতরকম কৌশল খাটাইয়া কতরকম পরীক্ষা করিয়া এই পাতাকে নাচাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার যদি খবর লও, তবে বুঝিবে বৈজ্ঞানিকের দেখা আর সাধারণ লোকের দেখায় তফাত কিরকম!